বাংলা একাডেমি ও অমর একুশে বইমেলা : রক্ষা করতে হবে দুটিকেই

অনুপম সৈকত শান্ত

গত ২৬ ডিসেম্বর শ্রাবণ প্রকাশনীকে বইমেলা থেকে দুই বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। গত বছর বইমেলা-২০১৬ থেকে গ্রেপ্তারকৃত ব-দ্বীপ প্রকাশনীর প্রকাশক শামসুজ্জামান মানিকের মুক্তির আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কারণে বাংলা একাডেমি এই ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তারও আগের বছর বইমেলা-২০১৫ থেকে রোদেলা প্রকাশনীকে নিষিদ্ধ করা হয়। এইবছর বইমেলা শুরুর আগে আগে পুলিশ দিয়ে বই এর বিষয়বস্তু পরীক্ষা করবার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। প্রকাশনী নিষিদ্ধ এবং বইয়ের বিষয়বস্তুর ওপর খবরদারির এই ধারাবাহিক তৎপরতা অভূতপূর্ব। বাংলা একাডেমি নামক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটির এই ভূমিকা এই প্রতিষ্ঠান ও বইমেলার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এই প্রবন্ধে একাডেমি ও বইমেলার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে করণীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

গত ২৬ ডিসেম্বর শ্রাবণ প্রকাশনীর কর্ণধার রবিন আহসান পরবর্তী বইমেলা-২০১৭ এর স্টল বরাদ্দের জন্য একাডেমিতে আবেদনপত্র নিতে গেলে তাঁকে বইমেলা থেকে দুই বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। গত বছর বইমেলা-২০১৬ থেকে গ্রেপ্তারকৃত ব-দ্বীপ প্রকাশনীর প্রকাশক শামসুজ্জামান মানিকের মুক্তির আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কারণে বাংলা একাডেমি এই ব্যবস্থা নিয়েছে। 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' দেয়ার 'উপাদান' রয়েছে বলে পুলিশের কাছে শোনার পর গত বছর একুশের বইমেলায় ব-দ্বীপ প্রকাশনীর স্টল বন্ধ করে দেয় বাংলা একাডেমি। এরপর তথ্য-প্রযুক্তি আইনে ব-দ্বীপ প্রকাশনীর মালিক মানিককে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। তারও আগের বছর বইমেলা-২০১৫ থেকে রোদেলা প্রকাশনীকে নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রাবণ প্রকাশনীর কর্ণধার রবিন আহসান প্রতিটি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন। একইভাবে তিনি ব-দ্বীপ প্রকাশনীর প্রকাশক শামসুজ্জোহা মানিকের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, টক শোতে কথা বলেছেন। আর এটিকেই ভালো চোখে দেখেননি বাংলা একাডেমির বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জোহা খান বলেন, "গত বছর আমরা ব-দ্বীপ প্রকাশনীকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারা ধর্মীয় বিষয়ে অশ্লীল বই প্রকাশের কারণে অভিযুক্ত হয় এবং হেফাজত বইমেলায় আক্রমণের হুমকি দেয়। ওই প্রকাশনী থাকলে বইমেলা পুড়িয়ে দেয়া হতো। এরপর সে (রবিন আহসান) ওই প্রকাশনীর পক্ষে টিএসসিতে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছে।" এ জন্যই কি দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন তিনি–এমন প্রশ্নে মহাপরিচালক বলেন, "হ্যাঁ।" অর্থাৎ বাংলা একাডেমি নামক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটি এমনই স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তি মানুষের প্রতিবাদ করার, সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকারটি কেড়ে নিতেও উদ্যত হচ্ছে!

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা, এর প্রসার ও প্রচারের মতো খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাংলা একাডেমির ঘাড়ে; যদিও এটিকে সরকারের হাতের মুঠোয় নিয়ে গিয়ে ক্রমশ একটি বন্ধা ও বদ্ধসংস্থায় পরিণত করা হচ্ছে।

এই নিষিদ্ধ করার কথা প্রকাশিত হওয়ার পরপরই তরুণ লেখক ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা একাডেমির এই সিদ্ধান্তকে মুক্তবুদ্ধির ওপর আঘাত উল্লেখ করে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের পদত্যাগ দাবি করেন। পাশাপাশি শ্রাবণ প্রকাশনীকে মেলায় ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান। আন্দোলন ও প্রতিবাদের মুখে প্রকাশনা সংস্থা শ্রাবণ প্রকাশনীকে অমর একুশে বইমেলায় দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বাংলা একাডেমি। অবশেষে গত ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে বাংলা একাডেমির নির্বাহী পর্ষদের এক সভায় 'শর্ত সাপেক্ষে' আগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। সভা বিষয়ে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, "আট সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পর্ষদের সভায় একাডেমির আগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে।" তবে যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো স্টল বরাদ্দের ফরমের সাথেই থাকে বলে দাবি করেছেন শ্রাবণ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী রবিন আহসান। তিনি বলেন, "নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার পথ বের করার জন্য আবারও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেসব শর্তের কথা আমি সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি সেসব শর্তসহ লিখিত অঙ্গীকারনামা আমরা সব সময়ই দিই। এসবের কোনোটিই শ্রাবণ প্রকাশনী কখনো করেনি।"

বইমেলা থেকে পর পর তিন বছরে তিনটি প্রকাশনী নিষিদ্ধ করাসহ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের নানা রকম আপত্তিকর বক্তব্যের কারণে দেশজুড়ে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এবং মহাপরিচালকের পদত্যাগের যে দাবি উঠেছে তাতেই মূলত শ্রাবণ প্রকাশনীর নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে বাংলা একাডেমি। এ যেমন আন্দোলনের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এটাও ঠিক, এখনো রোদেলা ও ব-দ্বীপ প্রকাশনীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যায়নি, ভবিষ্যতেও মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকির মুখে যে বাংলা একাডেমি আগ বাড়িয়ে আরেকটি প্রকাশনাকে বইমেলা থেকে নিষিদ্ধ করবে না বা আরেকটি প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নিতে উদ্যত হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা আমরা দেখতে পাই না। তদুপরি, শ্রাবণ প্রকাশনী নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনের সময় অনেকেই বাংলা একাডেমি বাদ দিয়ে একুশে বইমেলা করার দাবি তুলেছেন, বাংলা একাডেমিকে কেবল বাংলা অভিধান বের করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাই বিস্তারিত কিছু কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি।

বাংলা একাডেমি ও একুশে বইমেলা– দুটোই জনগণের ধারাবাহিক সংগ্রামের ফসল। বাংলা একাডেমি গড়ে ওঠে আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। আর ফেব্রুয়ারি বইমেলার শুরু ৯ মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের ঠিক পরের ফেব্রুয়ারিতেই। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা, এর প্রসার ও প্রচারের মতো খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বাংলা একাডেমির ঘাড়ে; যদিও এটিকে সরকারের হাতের মুঠোয় নিয়ে গিয়ে ক্রমশ একটি বন্ধা ও বদ্ধ সংস্থায় পরিণত করা হচ্ছে। একইভাবে আজকের বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক মিলনমেলায় পরিণত হওয়া ও বাংলাদেশের লেখক-প্রকাশক-পাঠক–সকলের জন্যই একটি উৎসব হয়ে দাঁড়ানো বিগত বছরগুলোতে অমর একুশে গ্রন্থমেলাকে জঙ্গিবাদী-মৌলবাদীরা তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। নানা দিক থেকে আক্রমণ চলছে। আর বইমেলার দায়িত্বে থাকা বাংলা একাডেমিও মৌলবাদীদের সাথে সুর তুলে কূপমণ্ডূক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। এ থেকে পরিত্রাণ বইমেলাকে

প্রত্যাখ্যান করে সম্ভব নয়, কয়েকজন প্রকাশককে নিয়ে বাংলা একাডেমির বাইরে বইমেলা আয়োজন করেও সম্ভব নয়। বরং বাংলা একাডেমিকে পাল্টাতে হবে। একুশে বইমেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে, একে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে, একটি গণমুখী-স্বাধীন মত-পথ-চিন্তার প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাংলা একাডেমির প্রয়োজন। ফলে বাংলা একাডেমিকে পাশ কাটানো সমর্থন করতে পারি না। বাংলা একাডেমি আর আমাদের বইমেলার ইতিহাসটি তাই দেখে আসা উচিত।

বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিন 'বর্ধমান হাউস'-এর সম্মুখস্থ বটতলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কথাসাহিত্যিক বশীর আল-হেলালের মতে, বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংগঠনের চিন্তা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে প্রথমবার ভাষাসংক্রান্ত একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। ১৯৫২ সালের ২৯ এপ্রিল দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'বাংলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা দাবি প্রণয়ন করেছিল তার ১৬ নম্বর দাবিটি ছিল, "যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে অবস্থান করিবে এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে!" অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার 'বাংলা একাডেমি' উদ্বোধন করেন। বাংলা একাডেমির প্রথম সচিব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ। তাঁর পদবি ছিল 'স্পেশাল অফিসার'। ১৯৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক। বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত বই আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লাইলী মজনু'। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দ্য বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট ১৯৫৭' গৃহীত হয়। এই আইনে বাংলা একাডেমিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়। ১০ আগস্ট ১৯৫৭ তারিখ ওই আইন বলবৎ হয়। বাংলা একাডেমি কাউন্সিলে ছয়জন নির্বাচিত সদস্যের বিধান রাখা হয়। ১৯৫৮ সালের ২৬ মার্চ কাউন্সিলের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

> বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংগঠনের চিন্তা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দ্য বাংলা একাডেমি অর্ডার, ১৯৭২' জারি করেন। এই আদেশ দ্বারা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমির সাথে সমন্বিত হয়, কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' করা হয় এবং মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় বাংলা একাডেমির প্রধান নির্বাহী হিসেবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর মযহারুল ইসলাম বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত হন।

> "যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে অবস্থান করিবে এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে!"

বইমেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বইমেলার চিন্তাটি এ দেশে প্রথমে মাথায় আসে প্রয়াত কথাসাহিত্যিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক সরদার জয়েনউদদীনের। তিনি বাংলা একাডেমিতেও একসময় চাকরি করেছেন। বাংলা একাডেমি থেকে ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পদে নিয়োগ পান। সে সময় তিনি ইউনেসকোর শিশু-কিশোর গ্রন্থমালা উন্নয়নের একটি প্রকল্পে কাজ করছিলেন। কাজটি শেষ হওয়ার পর তিনি একটি শিশু গ্রন্থমেলার ব্যবস্থাই করে ফেললেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি) নিচতলায়। যত দূর জানা যায়, এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে।

এরপরে তিনি ১৯৭০ সালে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জে একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলায় আলোচনা সভারও ব্যবস্থা ছিল। সেসব আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল হাই, শহীদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও সরদার ফজলুল করিম। ১৯৭২ সালে তিনি যখন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক, তখন ইউনেসকো ওই বছরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন তিনি। সেই থেকেই বাংলা একাডেমিতে বইমেলার সূচনা।

ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার ইতিহাসটিও স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই নিয়ে বসেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এ বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। একই সাথে স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনীর কিছু বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেন। বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলামও ওভাবেই তাঁদের বই নিয়ে বসে যান। এভাবেই এ তিন প্রকাশক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি মহান একুশে মেলা উপলক্ষে ১৫ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এর পাশাপাশি মুক্তধারা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স এবং এদের দেখাদেখি আরো কেউ কেউ বাংলা একাডেমির মাঠে নিজেদের বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির উদ্যোগে একটি বিশাল জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মেলার উদ্বোধন করেন। ওই গণজমায়েতকে সামনে রেখে ঢাকার বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান একাডেমির পূর্ব দিকের দেয়াল বরাবর নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় যে যার মতো কিছু স্টল নির্মাণ করে বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এতে বাংলা একাডেমির কোনো ভূমিকা ছিল না শুধু মাঠের জায়গাটুকু দেয়া ছাড়া। ১৯৭৫ সালে একাডেমি মাঠের কিছু জায়গা চুনের দাগ দিয়ে প্রকাশকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রকাশকরা যে যার মতো স্টল তৈরি করে বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় পর্যন্ত এই আয়োজনের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। কোনো নামও দেয়া হয়নি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেও এর কোনো উল্লেখ থাকত না। এমনকি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানসূচিতেও এই কার্যক্রমের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ সালে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি;

এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮১ সালের একুশে বইমেলার মেয়াদ কমিয়ে ২১ দিনের পরিবর্তে ১৪ দিন করা হয়। কিন্তু প্রকাশকদের দাবির মুখে ১৯৮২ সালে মেলার মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধি করে করা হয় ২১ দিন। মেলার উদ্যোক্তা বাংলা একাডেমি। সহযোগিতায় ছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। ১৯৮৩ সালে কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজন সম্পন্ন করেন। কিন্তু স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষা ভবনের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে ট্রাক তুলে দিলে দুজন ছাত্র নিহত হয়। ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সেই বছর আর বইমেলা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে এই মেলার নতুন নামকরণ হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'।

> বইমেলার চিন্তাটি এ দেশে প্রথমে মাথায় আসে প্রয়াত কথাসাহিত্যিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক সরদার জয়েনউদদীনের।

এরপর প্রতিবছর বইমেলা বিশাল থেকে বিশালতর আকার ধারণ করে, মেলা উপলক্ষে বিপুল বই প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের লেখকরা, প্রকাশকরা বস্তুত সারা বছর এ বইমেলার জন্য অপেক্ষা করেন।

বইমেলাকে বাংলা একাডেমির খপ্পর থেকে বের করা প্রসঙ্গে

অমর একুশে বইমেলাকে বাংলা একাডেমির খপ্পর থেকে বের করার দাবি উঠেছে। অনেকে বলছেন, এটা বেআইনি, বা আইন অনুযায়ী বইমেলা করার কোনো এখতিয়ারই বাংলা একাডেমির নেই। অমর একুশে বইমেলাকে বাংলা একাডেমির হাত থেকে বের করে কার হাতে কিভাবে ছেড়ে দেয়া যায়, সে ব্যাপারে অনেকে জানাচ্ছেন, প্রকাশকরা মিলে এটা করবে। এসব বক্তব্য বা দাবির সাথে একমত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ দেখছি না, বাংলা একাডেমি নামের এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিরক্তি আমাদের এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে অনেকে আমরা একে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে, কোনো রকমে অমর একুশে বইমেলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি–এ রকমটা মনে হচ্ছে। কয়েকটা ব্যাপারে তাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

১. প্রকাশকদের এ রকম কোনো সংস্থা বা সমিতি নেই, যার হাতে জাতীয় পর্যায়ের এ রকম বইমেলা আয়োজনের ভার দেয়া যায়। দুটো সমিতির কথা জানতে পারি। বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি–দুটোরই গড়ে ওঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রধানত প্রকাশকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করা। এটাও ভোলা উচিত হবে না যে প্রকাশকরা মূলত ব্যবসায়ী। আমি ব্যবসায়ীদের চেয়ে শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক-লেখক-চিন্তাবিদদের নিয়ে গড়া কোনো স্বায়ত্তশাসিত গোষ্ঠীর হাতে এ রকম বইমেলার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব।

> যত দূর জানা যায়, এটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে।

২. এ রকম বইমেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের ভূমিকা, পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। সেই দিকটি আমরা ভুলে যাচ্ছি। বাংলা একাডেমির আয়োজনে কেবল ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে একুশে বইমেলাই নয়, সারা দেশের পাবলিক লাইব্রেরিগুলোর উদ্যোগে এবং বাংলা একাডেমি তথা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন দরকার। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা এবং এর প্রসারে বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করা ভয়ানক ভুল।

৩. বাংলাদেশে মননশীল, সৃজনশীল, গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলোর বড় পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা একাডেমির অন্যতম দায়িত্ব। ব্যবসায়ী প্রকাশনাগুলো তো বাজার কাটতি বই ছাপাবে, বিক্রিবাট্টা করবে। এ রকম মননশীল গবেষণাধর্মী বই প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমি কিন্তু বইও প্রকাশ করে (কেবল অভিধান প্রকাশ নয়, অন্যান্য বই প্রকাশ করাও বাংলা একাডেমির কাজ, সেই অর্থে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা সংস্থাও)। অন্যান্য প্রকাশনা সংস্থার সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে, এর চরিত্র অব্যবসায়ী, অর্থাৎ মুনাফা মূল উদ্দেশ্য নয় বা এর টিকে থাকার জন্য তথা পরবর্তী বই প্রকাশের জন্য আগের বইয়ের বিক্রি হওয়ার–বই বিক্রি থেকে যথাযথ রিটার্ন আসা–এসব শর্তের সংযোগ নেই। সে জায়গা থেকেও বাংলা একাডেমির হাতে বইমেলার দায়িত্ব রাখতে চাই, যার পেছনে বাংলাদেশের মানুষের হাতে বাংলা বই তুলে দেয়া, দেশের সব ধরনের প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে একটা জায়গা দেয়া, যাতে লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের মিলনমেলা ঘটে এবং প্রকাশকদেরও নানা ধরনের বই বিক্রিবাট্টার মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত হয়। ফলে এখানে বাংলা একাডেমির ভূমিকা প্রকাশনা সংস্থাগুলোর প্রতি সহায়তামূলক। কিন্তু প্রকাশনা সংস্থাগুলো নিজেরা বইমেলা করলে তখন তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থটাই প্রধান হবে। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, বড় প্রকাশনা-ছোট প্রকাশনার মধ্যে ন্যায্যতা বিধান–এসব বিষয় সামনে চলে আসবে।

৪. বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা, বই প্রকাশ, বাংলাদেশের অপরাপর জাতিভাষাসমূহ নিয়েও গবেষণা, বই প্রকাশ, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার, বিস্তার প্রভৃতির জন্য বাংলা একাডেমির গুরুত্ব অসীম। সেই জায়গা থেকে এ রকম বইমেলা আয়োজন করাও বাংলা একাডেমির কাজ বলে মনে করি। বাংলা একাডেমির মধ্যকার ঝামেলা দেখে তাকে আর সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরিয়ে কেবল অভিধান করার কাজে নিয়োজিত করা কাজের কিছু বলে মনে করি না। বরং এই বাংলা একাডেমির আজকের এই অবস্থা, এই চরিত্র–এটাকে পাল্টানোর জন্য কাজ করাটা অধিক জরুরি। বাংলা একাডেমির সমস্যার স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করাও তাই খুব জরুরি।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বায়ত্তশাসন

আমার মতে, এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার একটা মূল ভরকেন্দ্র আমরা হারিয়ে ফেলছি। সেটি হলো, বাংলা একাডেমির চরিত্র ও স্বরূপ কেমন হবে? এ রকম একটি প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসিত হওয়াটা একেবারেই প্রাথমিক শর্ত হওয়া উচিত। জ্ঞানকাণ্ডের সাথে জড়িত বা যুক্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠান, তা সে বিশ্ববিদ্যালয় হোক আর বাংলা একাডেমি হোক আর গবেষণা প্রতিষ্ঠান হোক, তার সরকারের প্রভাবমুক্ত হওয়া খুব দরকার, স্বাধীনভাবে জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞানের প্রসার প্রভৃতির জন্য। রাষ্ট্রায়ত্ত বা পাবলিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়েই সরকার এই যুক্তিতে খবরদারি করার প্রচেষ্টা চালায় যে যেহেতু এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের দায়িত্ব সরকার পালন করছে; অথচ সরকার যেমন জনগণের অর্থে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত ও পরিচালিত, একইভাবে এই সমস্ত পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার অর্থও সরকারের নয়–জনগণের।

বিভিন্ন জায়গায় বাংলা একাডেমিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হলেও আমি অবাক হয়ে খেয়াল করলাম, বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩ এর কোথাও 'স্বায়ত্তশাসন' শব্দটির উপস্থিতি নেই। অথচ সেই পাকিস্তান আমলে দ্য বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট ১৯৫৭ এ বাংলা একাডেমিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই বাংলা একাডেমির ওপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ জারি করা শুরুও হয় পাকিস্তান আমলে, ১৯৬০ সালের ২৬ জুলাইয়ের 'দ্য বেঙ্গলি একাডেমি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স'-এর মাধ্যমে। স্বাধীন বাংলাদেশেও আইয়ুব খানের সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়।

১৯৭২ সালের ১৭ মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দ্য বাংলা একাডেমি অর্ডার ১৯৭২' জারি করেন, এতে কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' করা হয় এবং মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় বাংলা একাডেমির প্রধান নির্বাহী হিসেবে। এরপর ১৯৭৮ সালের ৬ জুন 'দ্য বাংলা একাডেমি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮' জারি করা হয়। ১৯৮৩ সালের ২৫ মে তারিখে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এক আদেশবলে কিছু পরিবর্তন করা হয় এবং সর্বশেষ ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩ করা হয়। সব সময়ই স্বায়ত্তশাসনের প্রসঙ্গটিকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই নিয়ে বসেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই।

বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩

বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩ এ কেবল স্বায়ত্তশাসন শব্দটি অনুপস্থিতই নয়, এই আইনের ধারায় ধারায় বাংলা একাডেমির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এভাবেই একে সরকারের একটি ক্রীড়াযন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। সে রকম কিছু ধারার দিকে লক্ষ দেয়া যাক:

প্রথমত, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নামক পদটি সৃষ্টির মাধ্যমে সভাপতি পদটিকে কেবল অলংকারিক করা হয়েছে। এবারে সভাপতি ও মহাপরিচালকের নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা দুটো দেখি :

"ধারা ৬: (১) রাষ্ট্রপতি একাডেমির সভাপতি নিয়োগ করিবেন। (২) প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, সাহিত্যিক অথবা স্বাধীনতা পদক বা একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একাডেমির সভাপতি নিযুক্ত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

ধারা ২৬: (১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন। (২) বাংলাদেশের নাগরিক এইরূপ কোন ফেলো অথবা প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ বা গবেষকদের মধ্য হইতে সরকার মহাপরিচালক নিয়োগ করিবে এবং তাঁহার চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।"

এর মাধ্যমেই বাস্তবে মহাপরিচালককে সরকারের একজন আজ্ঞাবহ সরকারি কর্মচারী বানানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাহী পরিষদের গঠন। পাকিস্তান আমলে এটি ছিল কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হতো ফেলো ও সদস্যদের নির্বাচনের মাধ্যমে। অথচ নির্বাহী পরিষদের কেবল সাতজন সদস্য ফেলো ও সাধারণ সদস্যরা নির্বাচিত করে পাঠাতে পারে (তিনজন ফেলো এবং চারজন সাধারণ সদস্য)।

১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ সালে মেলার সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি; এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা।

ধারা ২৩ (১) অনুযায়ী: "একাডেমির একটি নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা– (ক) মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন; (খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ঘ) কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ভাষাতত্ত্ব ও ইংরেজি বিভাগ এবং বিজ্ঞান অনুষদ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া সর্বমোট চারজন অধ্যাপক; (ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও একজন বিশিষ্ট তথ্য-প্রযুক্তিবিদ; (চ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী; (ছ) ফেলোগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন ফেলো; (জ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত চারজন সদস্য; (ঝ) সচিব, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।"

ধারা ৩০ (১) অনুযায়ী: "একাডেমির একজন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।"

অর্থাৎ নির্বাহী পরিষদের মহাপরিচালক এবং সদস্য-সচিব উভয়ই সরকার মনোনীত ও সরকারের আজ্ঞাবহ, এ ছাড়া এটায় থাকছে সংস্কৃতি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দুজন আমলা, সরকার মনোনীত একজন বিজ্ঞানী, সরকার মনোনীত একজন তথ্য-প্রযুক্তিবিদ, সরকার মনোনীত চারজন অধ্যাপক। উল্লেখ্য, মহাপরিচালকের অবর্তমানে মহাপরিচালক নিয়োগের আগ পর্যন্ত সচিব ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সচিবের অবর্তমানে একাডেমির একজন কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন, কিন্তু এই কর্মকর্তাকে নির্বাহী/সাধারণ পরিষদ নয়, সরকার ঠিক করে দেবে।

তৃতীয়ত, মহাপরিচালকের অপসারণ সরকারের হাতে রাখা হয়েছে। সভাপতির অপসারণ এবং মহাপরিচালকের অপসারণ সংক্রান্ত ধারা দুটি দেখলেই পার্থক্য বোঝা যাবে।

ধারা ৬ (৫) এ সভাপতির অপসারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে : "এই আইন লঙ্ঘন বা গুরুতর অনিয়ম বা অসদাচরণের অভিযোগে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একাডেমির সভাপতির বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে, নির্বাহী পরিষদ উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে এবং রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় তাহাকে অপসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

অন্যদিকে ধারা ২৮ এ মহাপরিচালকের অপসারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে : "(১) এই আইন লঙ্ঘন বা গুরুতর অনিয়ম বা অসদাচরণের অভিযোগে নির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে একাডেমির সভাপতির নিকট মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে, একাডেমির সভাপতি উক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিবেন এবং সরকার তাঁহাকে অপসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার মহাপরিচালককে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি–(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; (খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব-বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; (গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; বা (ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

রাষ্ট্রপতি সভাপতিকে নিয়োগ দিলেও তিনি এককভাবে তাঁকে অপসারণ করতে পারছেন না, সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সুনির্দিষ্ট

অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনাস্থা জ্ঞাপন করলে নির্বাহী পরিষদ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করলেই কেবল রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করবেন। অথচ মহাপরিচালকের অপসারণের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ অনাস্থা আনলে যেমন সভাপতি সরকারের বিবেচনার কাছে পাঠাবে, তেমনি সরকার নিজেও চাইলে চারটি অভিযোগের কারণে অপসারণ করতে পারবে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মহাপরিচালকের অপসারণের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের কোনো এখতিয়ার রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে নির্বাহী পরিষদের কাছে–যে নির্বাহী পরিষদের ৬০ শতাংশ সরকার মনোনীত অর্থাৎ এর মাধ্যমে মহাপরিচালকের একমাত্র দায়বদ্ধতা সরকারের কাছে রাখা হয়েছে (উল্লেখ্য যে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়–সভাপতি, মহাপরিচালক, একাডেমির ফেলোবৃন্দ এবং সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে)।

চতুর্থত, নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলিতে সরকারের আদেশ-নির্দেশ পালনের বিষয়টি যুক্ত করে এই আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবেই একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। ধারা ২৪ (১) (ঙ) অনুযায়ী : "সরকার বা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব পালন"।

পঞ্চমত, সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্ব নামেই সর্বময়, কার্যক্ষেত্রে একে কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা দেয়া হয়নি। এমনকি সাধারণ পরিষদের সাধারণ সভার সভাপতিত্ব একাডেমির সভাপতি করলেও এর আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবে মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিষদ। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কোনো ফেলো সভার সভাপতিত্ব করবে–সেটিও ঠিক করে দেবে নির্বাহী পরিষদ। এভাবেই বাংলা একাডেমির ভার শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদদের হাত থেকে নিয়ে পাকাপোক্তভাবে সরকার ও সরকারের আজ্ঞাবহদের কাঁধে দেয়া হয়েছে। আর সে কারণেই বাংলা একাডেমির যে কোনো অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ পরিষদ কোনো ভূমিকাও রাখতে পারে না।

পরিশেষে বলতে চাই, বাংলা একাডেমি ও অমর একুশে বইমেলা–দুটোই আমাদের দরকার, আমাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক, দুটোই আমাদের আন্দোলন-সংগ্রামের অর্জন। এহেন বাংলা একাডেমি ও বইমেলাকে তাই নষ্টদের হাতে আমরা ছেড়ে দিতে চাই না। তাই দাবি তুলি:

– বইমেলায় প্রকাশনী নিষিদ্ধ করবার চর্চা বন্ধ করতে হবে। এসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।
– বইমেলায় সকল লেখক-প্রকাশক-পাঠকের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা চাই।
– সরকারি খবরদারিমুক্ত, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গিবাদের কবলমুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় অঙ্গীকারাবদ্ধ সাহসী বাংলা একাডেমি চাই।
– বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩ বাতিল করে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে নতুন আইন চাই।

অনুপম সৈকত শান্ত: প্রকৌশলী ও গবেষক
ইমেইল : anupam.shaikat@gmail.com

তথ্যসূত্র:

http://banglaacademy.org.bd/btech/BwZnvm
http://www.beshto.com/questionid/38887
http://www.youtube.com/watch?v=vNQdkmXV-fI
http://bn.wikipedia.org/wiki বাংলা-একাডেমি
http://www.prothom-alo.com/art-and-literature/article/136348/
http://bn.wikipedia.org/wiki/অমর-একুশ-গ্রন্থমেলা
বাংলা ট্রিবিউন, ২৬ ডিসেম্বর ও ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬
বিডিনিউজ২৪, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬
বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩